৪.৫ বাংলায় বৈপ্লবিক তৎপরতা (১৯০২-১৯১৫)

উনবিংশ শতকের সাতের দশকে বাংলায় গুপ্ত সমিতি গঠনের প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়। মূলত ঠাকুর পরিবারের উদ্যোগে 'সঞ্জীবনী সভা' নামে এক গুপ্ত সংস্থা গঠন করে যুব সম্প্রদায়কে সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চলেছিল। শরীরচর্চা তখন জাতীয় সাংস্কৃতিক কাজকর্মে একটি আকর্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠে। বঙ্কিম ও বিবেকানন্দের প্রচারিত আদর্শের উপর ভিত্তি করে জাতীয় গর্বের অনুভূতির বিকাশ সাধন বিভিন্ন সমিতিগুলির উদ্দেশ্যে ছিল। বাংলায় বৈপ্লবিক কাজকর্মের উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ আমরা কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গড়ে উঠতে দেখি—(১) প্রমথ মিত্রের নেতৃত্বে 'অনুশীলন সমিতি' (প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু), (২) অরবিন্দের নির্দেশে ও উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত বারীন্দ্রকুমার ঘোষ পরিচালিত, 'Circle of friends', (৩) সরলা দেবীর প্রেরণায় 'বীরাষ্টমী সংস্থা' ও (৪) পুলিন বিহারী দাসের নেতৃত্বে 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'।[২৩] বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সংস্থা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মিলিতভাবে নানা রাজনৈতিক কার্যকলাপ শুরু করে। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা বৈপ্লবিক সমিতিতে পরিণত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার আগে পর্যন্ত অবশ্য আমরা পৃথকভাবে 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর' নামে দুই প্রতিষ্ঠানের সন্ধান পাই না।[২৪] যদিও বাংলার বিপ্লববাদে দুই উল্লেখযোগ্য সমিতি ছিল 'যুগান্তর' ও 'অনুশীলন সমিতি'। প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সমিতির উদ্দেশ্য ছিল শরীরচর্চার আড়ালে রাজনৈতিক শিক্ষাদান এবং অন্যটির উদ্দেশ্য ছিল বৈপ্লবিক আদর্শের প্রচার ও প্রসার।[২৫] ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এরা ছিল একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার দুই পৃথক শাখা।

সিডিশন কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় রাজনৈতিক ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ, অস্ত্র সংগ্রহ ও সরকারি কর্মচারীদের হত্যা—এই নীতির দ্বারা 'অনুশীলন সমিতি'র কর্মসূচি আবর্তিত হয়েছিল। 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র সদস্যরা অবশ্য অনেক বেশি কাজকর্মে যুক্ত ছিল। সমিতির কাজকর্ম সুপরিচালনার উদ্দেশ্যে জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে কর্মসূচিকে বিভক্ত করে দেওয়া হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি'র অধীনে প্রায় পাঁচশো শাখা সমিতি গড়ে উঠেছিল। 'যুগান্তর' দল অবশ্য বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল লোকমত গঠনের উপর। দলীয় নেতারা মনে করতেন যে ব্যাপক জনসমর্থন না পেলে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যর্থ হতে পারে। তাই অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে 'যুগান্তর' দল অস্ত্র ছিনতাই, অস্ত্রের কারখানা তৈরি ও বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানিকে গুরুত্ব দেয়। অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই সংগঠনটি রাজনৈতিক ডাকাতিকেও গুরুত্ব দিয়েছিল। বিপ্লবীদের কার্যাবলি বাংলায় কতখানি প্রসারিত হয়েছিল তার চিত্র লাউসের বক্তব্যের মধ্যে ফুটে উঠেছে, "The terrorist movement in India had deep roots only in Bengal.....only in Bengal did the movement have organizational continutiy and popular appeal and support."[২৬] ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের পর বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের মধ্যে সংহতি স্থাপিত হয়েছিল। এই সময় থেকে বৈপ্লবিক তৎপরতা প্রকাশ্যে ও গোপনে এই দুই খাত ধরে প্রবাহিত হতে থাকে। এক গোষ্ঠী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। চরমপন্থী মতবাদের সমর্থক অরবিন্দ ঘোষ বয়কট আন্দোলনকে মানবিক প্রতিবিধানের মর্যাদায় ভূষিত করেন। অন্যদিকে তিলকের কাছে বয়কট রাজনৈতিক যোগসাধনায় পরিণত হয়। বিপিনচন্দ্র পাল শৃঙ্খলিতের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ হিসাবে চিহ্নিত করেন। আরেক গোষ্ঠী ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র বিকল করার জন্য গুপ্তহত্যার পথকেই বেছে নেয়। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পরিচালনায় ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য, দেবব্রত বসু প্রমুখ প্রত্যক্ষভাবে এই কর্মে যুক্ত হন এবং তার পিছনে ছিল অরবিন্দ ঘোষের পূর্ণ সমর্থন। এই গোষ্ঠীরই মুখপত্র ছিল *যুগান্তর* পত্রিকা (১৯০৬)। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের *সন্ধ্যা* পত্রিকাও বৈপ্লবিক আদর্শ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা থেকে কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে চলে আসেন। *Bandemataram* পত্রিকার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমিক বিপ্লবীদের তিনি নানাভাবে অনুপ্রাণিত করতে শুরু করেন।[২৭] মূলত তাঁর নির্দেশে কলকাতার বাইরে মেদিনীপুর ও চন্দননগরে বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে চারুচন্দ্র রায়ের সঙ্গে বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং শ্রীশ চন্দ্র ঘোষ, কানাইলাল দত্ত এবং মতিলাল রায় বৈপ্লবিক কর্মে যুক্ত হয়ে পড়েন। বাংলায় গুপ্তহত্যার প্রথম

ব্যর্থ প্রচেষ্টাটি ছিল ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ববঙ্গের গভর্নর ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার চেষ্টা। পরের বছর (১৯০৮) অ্যান্ড্রু ফেজারকে হত্যার পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। সে যুগে বিপ্লবীদের ব্যবহৃত নানা অস্ত্রের মধ্যে বোমা তৈরি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় সম্পাদিত *সন্ধ্যা* পত্রিকায় 'কালি মাই কি বোমা' নামক প্রবন্ধ প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশ্যে বোমা তৈরির বিষয়ে যুব সমাজকে উৎসাহ দান করা হয়।[২৮] সে যুগে বোমা তৈরির ইতিহাসে যে ব্যক্তিগুলির নাম বিশেষভাবে যুক্ত ছিল তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, উল্লাসকর দত্ত, মণীন্দ্রনাথ নায়েক ও অমৃতলাল হাজরা।[২৯] ধীরে ধীরে বৈপ্লবিক আন্দোলনে বোমা তৈরি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাংলার বিভিন্ন গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি দেশে পথিকৃত হয়ে ওঠে। 'যুগান্তর' দলের সদস্যরা ইউরোপ থেকে বোমা তৈরির কৌশল শিখে এসে (হেমচন্দ্র কানুনগো) কলকাতার নানাস্থানে বোমা তৈরির কারখানা গড়ে তোলে। তার মধ্যে মুরারিপুকুরের এক বাগান বাড়িতে গড়ে ওঠা বোমা তৈরির কারখানাটি সর্বপ্রথম সরকারের নজরে এসেছিল। স্বদেশি আন্দোলনের চরম বিরোধী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যার জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকি বোমা ও পিস্তল নিয়ে হাজির হয় মজফ্ফরপুরে। কিংসফোর্ডের পরিবর্তে কেনেডি পরিবার বোমার আঘাতে নিহত হলে (৩০ এপ্রিল, ১৯০৮) ব্রিটিশ সরকার আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। প্রফুল্ল চাকি আত্মহত্যা করলেও ক্ষুদিরাম বসু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন (আগস্ট, ১৯০৮)। ক্ষুদিরামের আত্মত্যাগ বাঙালি যুবসমাজের কাছে প্রেরণার বিষয় হয়ে ওঠে। মজফ্ফরপুরের বিস্ফোরণের সূত্র ধরে মুরারিপুকুর বাগান থেকে বিস্ফোরক পদার্থ উদ্ধার এবং অরবিন্দ ঘোষ সহ বাংলার বিপ্লবীদের একটা বড়ো দল গ্রেপ্তার হয় এবং শুরু হয় 'আলিপুর বোমা ষড়যন্ত্র মামলা'। মামলা চলাকালীন বিপ্লবীরা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সামশুল আলম নামক পুলিশ অফিসার এবং সরকারি উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করে। সব থেকে দুঃসাহসিক ঘটনাটি ঘটায় চন্দননগরের অধিবাসী বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত। রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য নরেন গোস্বামীকে জেলখানার মধ্যেই গুলি করে হত্যা করেন।[৩০] আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দ মুক্তি পেলেও পনেরো জন বিপ্লবীর কঠোর শাস্তি হয়। একই সঙ্গে বৈপ্লবিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য সারা বাংলা জুড়ে শুরু হয় দমন নীতি। ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দল নিষিদ্ধ ঘোষণা হলে গোপনে বৈপ্লবিক প্রক্রিয়া শুরু হয়। কলকাতা থেকে চন্দননগর হয়ে পন্ডিচেরিতে অরবিন্দ আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখান থেকে কিছু দিন বাংলার বিপ্লবকে পরিচালনা করেছিলেন। কলকাতায় চরমপন্থী কাজকর্ম কিছুটা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়লেও 'ঢাকা অনুশীলন সমিতি' পুলিন দাসের পরিচালনায় নানা 'ইষ্টকর্ম' (Action) সম্পাদন করে যাচ্ছিল। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে বাংলার বৈপ্লবিক কর্মপন্থায় কিছু প্রকৃতিগত পরিবর্তন আসে। বিপ্লবীরা

ব্যক্তি হত্যার পরিবর্তে যুবক-কৃষক, শ্রমিক ও সেনাবাহিনীর সম্মিলিত শক্তি দিয়ে ব্যাপক বিপ্লবের কথা ভাবতে থাকেন। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতীন, নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ বিপ্লবী এই পথে অগ্রসর হন। বিদেশি শক্তির সহযোগিতা নিয়ে সশস্ত্র বিপ্লব ছিল এদের লক্ষ্য। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু অবশ্য বাংলার বাইরে থেকেই সম্মুখ যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে বৈপ্লবিক আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়। যুদ্ধের ফলে ইংল্যান্ডের প্রধান শত্রু জার্মানি ও তুরস্কের কাছ থেকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা লাভের যেমন সুযোগ সৃষ্টি হয় তেমনি হিন্দু-মুসলমানদের সমবেত প্রয়াসে ভারতের ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একটি জনমত গড়ে ওঠে। এই সময় বিপ্লবীরা বিভিন্ন দলকে—(১) ঐক্য সূত্রে আবদ্ধ করা, (২) বিদেশ থেকে অস্ত্র সংগ্রহ, (৩) গদর দলভুক্ত পাঞ্জাবি বিপ্লবীদের সাহায্যলাভ এবং (৪) সেনাদের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করে। বার্লিনে স্বাধীনতা কমিটির পক্ষে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন। ভারতে এ কাজটি সম্পন্ন করার জন্য রাসবিহারী বসু ও যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন) বিশেষ দায়িত্ব লাভ করেন। এই পর্যায়ে যতীন্দ্রনাথের অন্যতম কৃতিত্ব হল বিভিন্ন বিপ্লবী সমিতিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করা। ১৯১৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে রডা অ্যান্ড কোম্পানির আমদানি করা অত্যাধুনিক অস্ত্র পঞ্চাশটির মৌজার পিস্তল এবং ছেচল্লিশ হাজার রাউন্ড গুলি যতীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা মতো কৌশলে বিপ্লবীরা হস্তগত করে নেয় এবং নিজেদের শক্তিকে বহুগুণে বৃদ্ধি করে। ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে জার্মান থেকে অস্ত্র বোঝাই জাহাজ পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং সে অস্ত্রের সাহায্যে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণের লক্ষ্য ছিল। রাসবিহারীর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি সর্বভারতীয় বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের কর্মসূচিও গ্রহণ করেছিলেন। সমস্ত ঘটনা ব্রিটিশ গোয়েন্দারা জানতে পারলে জার্মান থেকে আগত অস্ত্র জাহাজ তিনটি (ম্যাভেরিক, অ্যানিলার্সেন ও হেনরি এস.) মাঝপথ থেকে ফিরে যেতে বাধ্য হয় এবং বুড়িবালামের তীরে অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য উপস্থিত বাঘাযতীন ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষ হয়। বুড়িবালামের যুদ্ধ ভারতের বৈপ্লবিক ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নেয়।